

# মানতালিও

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

সে বললে, খুব জানি, মানতলাও খুব বড় তবে ধারে বড় জঙ্গল। ভালুকের ভয় আছে, পাহাড় আছে, বাঘও আছে।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। অসহ্য গরম। বেলা চারটেবেজে গিয়েছে। ভাবলুম এই অসহ্য উত্তাপে বিহারের এমনসুন্দর হৃদে স্নান করা সৌভাগ্যের কথা।

সে প্রস্তাবে সবাই রাজী হল। আমার মন প্রথমত সায়েদেয় নি। কি জানি কেমন তলাও ! মিথ্যেই দেরি হয়ে যাবে গয়াপৌঁছতে !

কিন্তু যখন মোটরটি হৃদের সামনে পৌঁছলো—হঠাৎএসে পৌঁছলো একটা বনের বাঁক ঘুরেই—তখন হৃদের সেইঅপূর্ব রূপ আমাকে এত বিস্মিত করে দিলে যে আমি করণসিংকে বললাম—কি জন্যে তুমি এর কথা আগে বল নি ?

—কেন বাবুজি ?

—এমন চমৎকার একটা জায়গা—

—বড় জঙ্গল, ভালুক বাঘের ভয় আছে।

তা হোক, এমন অপূর্ব একটি জলাশয় আছে, যার ধারেই পশ্চিম তীরে সমান্তরাল নীচু শৈলমালা ও শালেরজঙ্গল, উত্তর তীরে মাইলটাক দূরে পুনরায় শৈলমালা এবংঘনসবুজ শালবন—কেবল পূর্ব ও দক্ষিণে পাহাড় নেই, বনওনেই—দিব্য সবুজ তৃণভূমি, একদম ফাঁকা ও সমতল, ফুটবলখেলার ভালো মাঠ হয়। এই মাঠের মধ্যে এদিকে ওদিকেদু-চারটি হরীতকি, শিব বৃক্ষ, শাল ও আসান গাছ। দক্ষিণকোণে চমৎকার অ্যাসবেস্টসের ছাদ বাঁধা ছোট বাংলো।বাংলোর ঠিক সামনাসামনি একটি পাথরের মোটা মোটাসোপানযুক্ত কারুকার্যবিহীন বাঁধা ঘাট—তারই ঠিক বগলে বড়বড় তক্তা জুড়ে হাত-দশ-বারো জলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—অনেকটা সুইমিং পুলের জাম্পিং বোর্ডের মতো।সেই তক্তাগুলোর প্রান্ত মোটা মোটা শালের খুঁটিতে আবদ্ধ।যেখানে তক্তাগুলো শেষ হয়েছে সেখানে একখানা ধূসর রং করা জাহাজের লাইফবোটের মতো গড়নের বোট বাঁধা।

মোটরে হাজারিবাগ থেকে গয়া যেতে যেতে এই অদ্ভুতহৃদটি পড়লো। ‘মানতলাও’ অবিশ্যি স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া নামটা। নামে কিছু আসে যায় না, এই অতি সুন্দর হৃদয়ে এমন এক বনাঞ্চলে আছে, গয়াগামী পিচঢালা রাস্তা থেকেতার কিছু বুঝবার উপায় নেই, যদি না হাজুদা রাস্তার পাশেরএকটা সাইনবোর্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতো। সাইনবোর্ডের গোড়ার দিকে ও দক্ষিণ পাশে একই সরলরেখায় একটি তীরের ফলা—হৃদের অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করচে।

এই রকম হল বিজ্ঞাপনটা :

মানতলাও হৃদ,

আসুন !

এখান হইতে দু ফার্লং দূরে বনের মধ্যে সুন্দর একটি হৃদ আছে। স্নান ও ভ্রমণের জন্য বনবিভাগ হইতে একটি প্রস্তর-বাঁধানো ঘাট ও নৌকাভ্রমণের জন্য একটি নৌকার ব্যবস্থা আছে। জ্যেৎস্নারাত্রি এই হৃদ বিশেষরূপে উপভোগ্য। ভ্রমণোচ্ছূদের জন্যে হৃদের ধারে যে বাংলো আছে চৌকিদারের নিকট উহার চাবি মিলিবে।

দর্শনী—এক টাকা

নৌকাভ্রমণ ফি—T০ আনা ঘণ্টা পিছু

বাংলো ভাড়া—দৈনিক৫টাকা।

এম, রাও

ডি এফ. ও.

গয়া ডিভিশন।

কখনো নাম তো শুনিনি মানতারাও হৃদের। অবিশ্যি কিকরেই বা শুনবো, ক'দিনই বা এদিকে এসেছি। দুজনেই আমরা নবাগত পশ্চিম সফরে। ড্রাইভার করণ সিং এ অঞ্চলের লোক, বিহার ট্রান্সপোর্টের বাসগুলিতে অনেকদিন কাজ করছে, তাকে বললাম—তুমি জানো করণ সিং, কি তালাও আছে এখানে ?

খুব চওড়া হৃদটা—আঁকাবাঁকা হৃদটা বনের ও-মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—নির্মল নীল জল, এবং হয়তো বললে বিশ্বাস করবেন না—তীরের কাছে কি চমৎকার সবুজ জলা ঘাস ও পান-কলস শেওলার বন—ঘাসে ফুল ফুটেচে নীলরঙের, পান-কলসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা 'বাটার কপ' ফুলের মতো। আর কী অজস্র ফুটে আলো করচে বনপ্রান্ত, সেই পড়ন্ত বেলায় কি ঘন সুবাস সদ্যফোটা কুরচিফুলের—সাদা বনভূমি মাতিয়ে ফেলেছে দুই সুবাসে, যদিকেই চাও সেদিকেই থোকা থোকা কুরচিফুল দুলচে বাতাসে। কি শোভা এই অপরিচিত অজ্ঞাত জলাশয় ও তার বন্য পরিবেশের ! কি অদ্ভুত নির্জনতা এর চারিপাশের। কোথাও একটি মানুষের চুলের টিকি দেখা যায় না—কেবল শোনো বিহঙ্গকাকলী, বন্যহনুমানের উপ্ আপ্ শব্দ দূরে বনের মধ্যে, আর জলাশয়ের বড় বড় ঢেউ ছপ্ছপ্ করে সেই তক্তা বাঁধা জেটির গায়ে এসে লাগবার শব্দ।

আমাদের বন্ধু ললিত প্রকৃতিকে দেখবার চক্ষু হারায় নি। সে দেখে-শুনে বলে উঠলো—শুধু এখানে বসে থাকো—ব্যস, আর কিছু না।

—তা খাওয়া ?

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে কি যে নির্দেশ করলে, কেউ বুঝতে পারলে না।

বললাম—বোট চড়বে ?

—হ্যাঁ ভাই। কিন্তু সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না উঠলে—কি বলো ?

রাত্রে তাহলে এখানে থাকতে হবে।

—থাকলাম।

—খাওয়া।

—সে হয়ে যাবে।

বলে সে আবার পূর্ববৎ অর্থহীন ইঙ্গিত করলে হাতনেড়ে। আমার ইচ্ছা যে একেবারে না ছিল তা নয়। মোটরথেকে সবাই নেমে পড়লাম। বাংলোর চৌকিদারকে ডাকাডাকি করা গেল, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমরা বাংলোর বারান্দায় জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সেখানে বসলাম। উদ্দেশ্য, চা তৈরি করার চেষ্টা দেখা। ললিত শীঘ্রই শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে এসে চা চড়িয়ে দিলে। করণ সিং চৌকিদারকে ডাকতে গেল।

চা খাওয়া শেষ হল। সূর্য অস্ত গেল ওদিকে পাহাড় শ্রেণীর ওপারে। চমৎকার ছায়াভরা প্রান্তর ও বনানী। বনানী প্রান্তস্থ এই বিরাট সরোবর, পাহাড়ের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেচে নির্মলকাক চক্ষু জলের পশ্চিম কোণে। পাখি-পাখালির কলরব ভেসে আসচে পাহাড়ের দিক থেকে।

এমন সময় করণ সিং চৌকিদারকে নিয়ে এলে দেখা গেল যে চৌকিদার একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে। নাম তার ট্যাম্পা।

আমরা বললাম—কোথায় গিয়েছিলি ?

—হাটিয়া মে।

—কাঁহা কা হাটিয়া ?

—গবিন্দপুর, দো মিল্ হাঁসে। পাহাড় কা বগল মে।

—রাত মে হামলোক বাংলো মে ঠহরনে সেকেগা ?

—জী, কাহে নেহি ?রহ যাইয়ে আপলোক। মগর হামারা পাস চাভি তো হ্যায় নেহি !

—চাভি কাঁহা গিয়া ?

—মেরে চাচাকে পাস্ হ্যায় মকান্ মে। হ্যাম্ যায় গা, মাগায় গা ?

—তব যাও, আউর মাগাও—

—আপ্ লোগোঁকো খানা কি ক্যা হোগা ?

—তুম্‌কো বানানে পড়েগা, সকেগা নেই ?

—কাহে নেই হুজুর ! মগর হিয়া কুছ নেহি মিলেগা। নাচাল, না দাল।

ঘাবড়াও মাৎ। সব চিজ হ্যায় হামলোগোঁকা গাড়িমে। তুম্ একঠো মুরগী মাগাও হাটিয়া সে—হাঁ ?

—দিজিয়ে দো রুপেয়া। গাঁও সে মাগায়েঙ্গে।

—বোট কাচাভি কাহা !

—ও খুলা হুয়া হ্যায়। লে যাইয়ে। একঠো, খাতামে সহিকরনে হোগা।

—খাতা লাও—

ট্যাম্পা খাতা সই করিয়ে চাবি আনতে চলে গেল। আমরা করণ সিংকে জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে বোট ছেড়েদিলাম।

সরোবরটি সব জায়গায় সমান চওড়া নয়, বোট নিয়েযত আমরা ওর দৈর্ঘ্য ধরেএগিয়ে চললাম, তত বাঁদিকের প্রস্থবাড়তে লাগলো—শেষে এমন হল যে ওপারের গাছপালা ছোট দেখাতে লাগলো, ওপারের পাহাড় হঠাৎ যেন বহুদূরে চলেগেল। হৃদের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে পাহাড়েরদিক থেকে বাতাস বইছে। ললিত বললে—ভাই, স্নান করাদরকার। বোট লাগাও কোনো এক জায়গায়।

আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল ওপারেরঅপূর্ব বন-সৌন্দর্য। এপারের তীরে তৃণভূমিই বেশি, মাঝেদু-চারটা বড়-ছোট গাছ। ললিতকে বললাম—চলো ওপারেবোট নিয়ে। ওখানে যাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র বীচিসঙ্কুল হৃদটি পার হতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগলো। এইখানেই হৃদটির প্রস্থ সর্বাপেক্ষা বেশি। পাহাড়ময় তীরভূমি যত কাছে আসতে লাগলো, ততই তার ঘন সবুজ রূপ আমাদের বাঙালি মনকে টানতে লাগলো ওর দিকে—এসব মরুভূমির মতো উষর দেশের কঙ্করময় রুক্ষতার মধ্যে শ্যামল বনানীর বৈচিত্র্য চোখ জুড়িয়ে দেয় কি ভাবে, তা উপলব্ধিকরার বস্তু, শুধুই কানে শুনে বা বইয়ে পড়ে তা বোঝা সম্ভবনয়।

ওপারে আমরা যখন পৌঁছে গেলাম তখন দিন ও রাত্রিরসন্ধিক্ষণ। একটু পরেই একাদশীর চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো জলে, বনে, পাহাড়ের সর্বত্র।

ওপারে পৌঁছে ডাঙায় নেমে দেখি, তীরভূমি কী সুন্দর !পাষণময় আগাগোড়া, সমতল laterite পাথরের বেদি যেন মস্ত বড়। ঠিক পেছনেই বন শুরু হয়েছে, একেবারে অনতিদূরস্থ শৈলসানু পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমি। পাষণময় চত্বরের দৈর্ঘ্য একশো হাতেরও বেশি, চওড়ায় প্রায় দশ-বারো হাত। আমাদের স্নান ও বিশ্রামের

জন্যে প্রকৃতি যেন পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছে। কি ঠাণ্ডা জায়গাটি, বনের কি সুন্দর স্নিগ্ধহাওয়া, কুরচিফুলের কি ঘন সুবাস জ্যোৎস্নামাখা বাতাসে !

আমরা জলে নামলাম। যত দূর যাই পায়ের তলায় শুধুই পাথর, যেন সিমেন্ট বাঁধানো সমতল চত্বর। জল ঈষত্তপ্ত, কিন্তু কাকচক্ষুর মতো নির্মল। জলে পড়েছে চাঁদের জ্যোৎস্না, পাহাড়ের ওপর বন্যকুকুট ডেকে উঠলো রজনীর প্রথম যামেরশুরুতে, সেই সঙ্গে ডেকে উঠলো শেয়ালের দল।

ললিত বললে—কি চমৎকার জায়গা ভাই !

—এমন যে জায়গা আছে তাই জানতাম না।

—অথচ কেউ আসে না। জানলে ভিড় জমে যেতো না। এই গরমের দিনে ?

তুমিও যেমন ! আমাদের দেশে এ সব জিনিস দেখবারশখ আছে ক'জনের ? কে আসতে লেক দেখতে ?

আমাদের পিছনে রহস্যবৃত্ত বনভূমি জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে অত্যন্ত গভীর ও বিপদসঙ্কুল বলে মনে হচ্ছে। করণ সিংভালুকের কথা তো বলেছিলই, বাঘের অস্তিত্বের সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিল, তাও অর্থপূর্ণ।

কিন্তু আমার মন ছিল না বনের বিপদের দিকে। সারাদিন প্রখর রৌদ্রতাপ, ধুলো ও ঘামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এই বনানী-বেষ্টিত নির্জন বিশাল জলাশয়ের গভীর জলে অবগাহন স্নান করবার আনন্দ আমার সব ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। হৃদের ধারে ধারে জলজ ঘাসেনীল ফুল ফুটে আছে—হাওয়ায় দুলালে ঘাসগুলো, উচ্ছে-লতার মতো কি একটা লতা ঝুলে পড়েছে জলে, পাথরের ওপর দিয়ে সাপের মতো সেটা চলে এসেছে জঙ্গলের দিক থেকে।

দুজনে পাষণ তীরভূমিতে উঠে সাবান মাখলাম আরামকরে, তারপর আবার নামলাম জলে। চাঁদের ছায়া ভেসে ভেসেযাচ্ছে জলের ভেতর, বুক-মুখে লাগছে ঢেউ, পাষণময় তটেমুদু শব্দে ছলাৎ ছলাৎ করচে, তাল খাচ্ছে, চারিধার নিশব্দনির্জন—কি সুন্দর রাত্রি, কি সুন্দর দেবলোকের সরোবরের মতো অগাধ জলরাশি ! তিড়িং করে একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠেই আবার জলে পড়ে গেল। জল ! জল—জীবনদায়িনী সুধার প্রবাহ ! ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি এই জল !

কিন্তু এই জলকে ঠিকমতো ভোগ করতে হলে এমনিধারা অগাধ জলের সরোবরে বানদীতে এমনি ছায়ানিবিড় বনফুলের ধারের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন স্নান করা চাই সারাদিনের পরিশ্রম, ধুলো ও দুর্দান্ত গ্রীষ্মের পরে। কলকাতার আঁটসাঁট বাথরুমে জলের কল খুলে স্নান করে কিছুতেই বোঝা যাবে না জলের কি মহিমা, অবগাহন স্নানের কি আনন্দ ! তার ওপরযদি জ্যোৎস্নারাত হয়, আর এমনি জনহীন সরোবরটি পাওয়া যায়, তবে সৃষ্টির আনন্দের অনেকখানি স্নান করে উঠে নিয়েআসা যায়—দৃষ্টির সাহায্যে ওর ফটো তুলে।

স্মৃতির পটে এই ফটো চিরদিন থেকে যাবে এবং জীবনের মহাসম্পদ হয়ে থাকবে।

স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে আবার আমরা বোট বেয়ে অজানা রহস্যলোকের দিকে এগিয়ে চলি পশ্চিম তীর ধরে। আমাদের বাঁ দিকের বন ও পাহাড় ধরে ধরে অনেকদূর বেয়ে চলেচিডাঙার কাছে—কোথাও বনের মধ্যে অজানা বনকুসুমের গন্ধ, কোথাও ঝাঁঝির সমস্বরে ঐকতান, কোথাও ঝরা পাতার ওপর অজানা কোন্ নিশাচর জন্তুর দ্রুত পদচারণের খস্ খস্ধ্বনি, কোথাও ডালপালা কাঁপিয়ে বাতাস ওঠার শব্দ—সমস্ত বনভূমিতে ততক্ষণ জ্যোৎস্না নেমেচে, কেবল নিবিড় ঝোপঝাপকিংবা পাহাড়ের খাঁজগুলো বড় অন্ধকার দেখাচ্ছে তখনো।

ললিত বললে—এ লেকের দেখচি সীমা নেই—কতদূরবাইবো ?

—চলো, আজ সারারাত বাইবো বোট।

—এবার বাংলাতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

—একরাত্রি না-ই বা খেলুম, চলো দেখা যাক।

এক জায়গায় ডাঙায় মস্ত বড় একটা হতুঁকি গাছ, তার ডালে ডালে আলোকলতা দুলে দুলে ঝুলে পড়েছে জলের উপর। বড় বড় পাথরের চাঁই সেখানটাতে জল পর্যন্ত নেমে এসেচে—সমস্তটাতেই জ্যোৎস্না পড়ে কি অপূর্ব দেখাচ্ছে!

আমরা আবার সেখানে বোট বেঁধে পাষাণের উপর জ্যোৎস্নায় বসলাম। কাছেই কত কি বন্য লতাপাতার ঝোপ, কটুতিক্ত গন্ধ উঠচে বাতাসে। রাত দশটা বেজেছে। দিনের গরম অনেকক্ষণ কেটে গিয়ে রাত্রির শীতল বাতাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে গায়ে দেবার কোনো মোটা জামাবা কাপড় নেই।

ললিত বললে—এ দেখি, কম্বল আনা উচিত ছিল—

—বেশ ঠাণ্ডা! সত্যি ভাই—

—চলো ফিরি।

হঠাৎ দু'জনেই অবাক হয়ে জ্যোৎস্নালোকিত জলরাশির দিকে চেয়ে দেখলাম একদল বুনো হাঁস পাহাড় থেকে নেমেছে। দিব্যি সাঁতার দিচ্ছে—দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন একদল শুভ্রা নারী জলকেলি শুরু করেছে। গা ছমছম করে উঠলো দুজনেরই। বাংলা থেকে অনেকদূর এসে পড়েছি, রাত্রিও গভীর, পেট চুইছুই করতে খিদেয়, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত ধরে গিয়েচে দুজনেরই।

বোট বেয়ে ফিরতে লাগলাম কুলের দিকে।

চাঁদ ঘুরে গিয়েচে। যেন মনে হল পথ হারিয়েছি, দিকনির্ণয় করতে পারচিনে—সমস্ত অঞ্চলটা যেন মায়াময় হয়ে গিয়েচে যেন পৃথিবী থেকে বহুদূরে মহাব্যোমের অন্য কোনো অজানা গ্রহে নির্জন বন-বেষ্টিত হ্রদের আমরা দুটি নিঃসঙ্গপ্রাণী, কোনো অজানা উপগ্রহের জ্যোৎস্নায় বিভ্রান্ত হয়ে পথহারিয়ে ঘুরছি, আমাদের সে পরিচিত পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজন থেকে চিরবিচ্যুত অবস্থায়। কতকাল যেন ছেড়ে এসেছি সেসব পরিচিত পথরেখা, তারায় তারায় পরিব্যাপ্ত আকাশ আর জ্যোৎস্না-ভরা জলরাশির দিকে চেয়ে সে অনুভূতি আরো দৃঢ় হল মনে।

খানিক দূর এসে বাঁদিকের পাহাড়ে স্পষ্ট একটা শব্দশোনা গেল, যেন করাত দিয়ে তক্তা চিরচে।

ললিত বললে—ভাই শোনো—

—বড় বাঘ, রয়েল বেঙ্গল গয়ার জঙ্গলে যথেষ্ট।

—তাড়াতাড়ি চলো—

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেআওয়াজ। খুব গভীর আওয়াজ নয়, ঠিক তক্তা চেরার শব্দ। করাতের কারখানায় বড় কলের করাতে তক্তা চিরচে। আমিবড় বাঘের এ ডাকের সঙ্গে সুপরিচিত।

যখন আবার আমরা ফিরে এলাম বাংলার ঘাটে, তখনরাত আড়াইটে। করণ সিং ঘরের দরজা বন্ধ করেছে বাঘের ভয়ে। তার ভয় যে অমূলক নয়, তার পরিচয় কিছু আগেই পেয়েছি।

ডাকাডাকি করতে করণ সিং ও আর-একটা লোক দোর খুললো। অন্য লোকটা আমাদের সেলাম করলে। করণ সিং জানিয়ে দিলে, এ সেই বালক চৌকিদারের চাচা।

বললাম—ক্যা নাম তুম্হারা?

—মুনেশ্বর মাহাতো, হুজুর।

—ঠিক হয়। ভাত পাকায়?

—হুজুর, ও তো দশ বাজেনেকো অন্তর মে পাকায় লিয়া। ভাত আউর মাস। খানা ঠাণ্ডা হো গিয়া হুজুর।

—কোই হরজ নেই। লে আও—

—টেবুল মে পারস করলে হজুর ?

—করো। করণ সিং, তুম্ খানা খায়া ?

—হাম্ তো চূড়া খা লিয়া। আউর কুছ নেহি খায়েঙ্গে।

আকর্ষ খাওয়া গেল, শেষরাত্রেরে মাংস আর ভাত। তারপর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। মুনেশ্বর বললে— হজুর, এ-সব জায়গায় ভোরে তাড়াতাড়ি দোর খুলবেন না। অনেক সময়বাঘ ওং পেতে থাকে দোরের কাছে, যেমন দোর খোলা হয়অমনি মানুষকে নিয়ে পালায়। একবার হয়েছিল এ বাংলোয়।

করণ সিং বললে—বাজে গল্প করো না। মানুষখেকো বাঘ না হলে অমন করে না। আমি বিহার ট্রান্সপোর্টে কাজ করচি বিশ বছর। কত পাহাড় জঙ্গল ঘুরেছি, কখনো শুনিনি এমন কথা।

মুনেশ্বর রেগে বললে—আপ লোক ক্যা জানতা ?মোটর সে ম্তাহ্যায়, জঙ্গল কা হালচাল ক্যা মালুম হ্যায় আপ লোগোঁকা? ছোড় দিজিয়ে ও বাং—আপলোক রহিয়েইহা পর দো পাঁচ রোজ, আপকো নেহি দেখলানে সকেঙ্গে তোজুর্মানা দেঙ্গে দশ রুপৈয়া জরুর—

বেলা আটটায় দুজনে উঠলাম। তার আগেই মুনেশ্বর উঠে দোর খুলেচে, সুতরাং বাঘের ফাঁড়া থাকলেও কেটেগিয়েছে।

চা তৈরি করলে ললিত।

আমরা রওনা হবার আগেহুদের জলে স্নান করে নিলাম। জল অত্যন্ত শীতল। শরীরে যেন নতুন বল পেলাম, নতুন আনন্দ, নব-জীবন। সামনে আবার আজ যখন পড়বে বিহারের দুর্দান্ত গরম, লু বইবে দুপুরের দিকে, বালির ঝড়ে দিক অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন দোর বন্ধ করে খাটিয়ায় শুয়ে মনে পড়বেএই অদ্ভুত মায়াময় হৃদটি, এই অগাধ স্নিগ্ধশীতল জলরাশি, এই শ্যামল বনাকীর্ণ উপত্যকা। গতরাত্রেরে জ্যোৎস্নালোকিত হৃদবক্ষের স্মৃতি হয়ে পড়বে তখন দূরকালের স্বপ্নের মতো অবাস্তব।

বিদায়, অজানা সরোবর, বিদায় !

আবার এ পথে এলে দেখা হবে নিশ্চয়।